আমার স্বপ্ন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার স্বপ্ন

সূচিপত্র

বাতাসে তুলোর বীজ ১৬৩, এক একদিন উদাসীন ১৬৩, যদি নির্বাসন দাও ১৬৪, বহুদিন লোভ নেই ১৬৬, শব্দ ১৬৬, আমার কৈশোরে ১৬৮, রূপালি মানবী ১৬৯, জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না ১৭০, শোকসভায় এক সন্ধ্যা ১৭১, কিশোর ও সন্ন্যাসিনী ১৭২, মুক্তি ১৭৪, যা ছিল ১৭৪, চন্দনকাঠের বোতাম ১৭৫, আমি যদি ১৭৭, গদ্যছন্দে মনোবেদনা ১৭৭, হাসন্ রাজার বাড়ি ১৭৮, তিনজন মানুষ ১৭৯, পেয়েছো কি ? ১৮০, রক্তমাখা সিঁড়ি ১৮১, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ১৮২, দু'পাশে ১৮৩, ধাত্রী ১৮৪, মানে আছে ১৮৫, নীরার দুঃখকে ছোঁয়া ১৮৫, কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে ১৮৭, দেরি ১৯১, সেই মুহূর্তটা ১৯২, দেখা হয়নি ১৯৩, সেই ছেলেটি ও আমি ১৯৩, মানুষ ১৯৪, পতন ১৯৫, নশ্বর ১৯৬, রাগী লোক ১৯৭, বিদেশ ১৯৮, সৃষ্টিছাড়া ১৯৯, ছায়া ১৯৯, ভুল বোঝাবুঝি ২০০, প্রেমবিহীন ২০১, উনিশশো একাত্তর ২০২

বাতাসে তুলোর বীজ

বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি, এ যেন শিল্পের রূপ—
আচমকা আলোর রশ্মি পপি ফুল ছুঁয়ে গেলে
যে রকম মিহি মায়াজাল
বাতাসে তুলোর বীজ তুমি কার ?
পাহাড়ী জঙ্গল
থেকে
উড়ে এলে
খোলা-জানলা পাঁচকোনা ঘরে
আমার শব্দের রেশ উড়ে যায়
নামহীন নদীটির ধারে
স্বপ্নের ভিতর ফোটে স্নেহের মতন জ্যোৎস্না
বৃদ্ধ কৃষকের ছায়া
আলপথে দাঁড়িয়ে ধানের গন্ধ নেয়
ঘুমে আঠা হয়ে আসে দূরে কোনো অচেনা নারীর চোখ....
এ যেন শিল্পের রূপ
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি
বাতাসের তুলোর বীজ, তুমি কার ?

এক একদিন উদাসীন

এমনও তো হয় কোনোদিন
পৃথিবী বান্ধবহীন
তুমি যাও রেলব্রীজে একা—
ধূসর সন্ধ্যায় নামে ছায়া
নদীটিও স্থিরকায়া
বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা ।

ইস্টিশানে অতি ক্ষীণ আলো
তাও কে বেসেছে ভালো
এত প্রিয় এখন দ্যুলোক
হে মানুষ, বিস্মৃত নিমেষে
তুমিও বলেছো হেসে
বেঁচে থাকা স্বপ্নভাঙা শোক !
মনে পড়ে সেই মিথ্যে নেশা ?
দাপটে উল্লাসে মেশা
অহঙ্কারী হাতে তরবারি
লোভী দুই চক্ষু চেয়েছিল
সোনার রুপোর ধুলো
প্রভুত্বের বেদী কিংবা নারী !
আজ সবকিছু ফেলে এলে
সূর্য রক্তে ডুবে গেলে
রেলব্রীজে একা কার হাসি ?
হাহাকার মেশা উচ্চারণে
কে বলে আপন মনে
আমি পরিত্রাণ ভালোবাসি !

যদি নির্বাসন দাও

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো !
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত তুমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো ।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী !
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রূরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাস ফুল—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো ।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দীঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক ?
আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি ?
মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর ?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ…
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাব ।

বহুদিন লোভ নেই

বহুদিন লোভ নেই, শব্দে শিহরন, স্বপ্নে শিহরন, ঘুম
শরীরে দুপুর এলো; যেন বহুদিন লোভ নেই
বহুদিন লোভ নেই, শ্মশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ;

এবার তোমার কাছে চলে যাবো, 'তুমি' বহু গ্রন্থ থেকে চুরি.
এরকম যেতে হয়, বিকেলে মন খারাপ হলে তোমার ছায়ায়
না গেলে মানায় না, কিংবা চিঠি, বহু পুরোনো ভুলের
শোক থেকে ছায়ার ভিতরে জ্যোৎস্না, অথবা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ফেলা
শরীরের নিবেদন,—বৃষ্টি থেকে ঘুম থেকে উঠে
তোমার বিজন ভালো, অশ্রু ভালো, বুক ভালো, এমন কি সর্বস্বতা খুলে
ভাঁটফুল দেখা ভালো, চোখ বুজে চোখ রাখা ভালো ।

এরকম রাখা গেছে বহুবার, 'তুমি' নও, তাদের সবারই নাম ছিল
তাঁবুর ভিতরে সুশ্রী মুখখানি বরফের জীবনে ডুবেছে
তাঁবু মিথ্যে, সুশ্রী মিথ্যে, বরফ, জীবন, ডোবা কম মিথ্যে নয়
যেমন কবিতা মিথ্যে,
রক্তমাখা হাতে বেণী খুলে দিলে স্ত্রীলোকের যেমন আনন্দ
যেমন পৃথিবী থেকে সব গাছ খুন করেছিল পাগলা কবি
এরকম দিন গেছে, প্রতিদিন নাম জেনে ভুলে যাওয়া মুখ
লোভহীন উদাসীন, বিশাল চিৎকারে বহু মিথ্যে অসীমতা
এরকম দিন গেছে, দিনের ভিতরে শুকনো চড়া পড়ে আছে !

বহুদিন লোভ নেই, শ্মাশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ।

শব্দ

ঝাটিংগা নামের এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে
হারাংগাজাও নামে একটা
নম্র ছিমছাম স্টেশন
পাথুরে প্ল্যাটফর্মে একজন রেলবাবু কাঁঠালের দর করছেন

আমাদের কামরায় পর্যাপ্ত ভিড় ও হাতকড়া বাঁধা
দু'জন খুনী আসামী
এবং উজ্জ্বল স্কার্ট-পরা চারটি
সুস্বাস্থ্যবতী অহঙ্কারী খাসিয়া তরুণী,
কয়েকজন শিখ সৈনিক,
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ
আর, দু'পাশে বিশাল আদিম পাহাড় ও
চাপ চাপ বিশৃঙ্খল অরণ্য
দৃশ্যটি এই রকম।

জানলার পাশে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম
ঝাটিংগা ও হারাংগাজাও এই দুর্বোধ্য নাম দুটি
মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করে
কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে দেয় না।
এও সেই শব্দের স্বজাতি যা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর
এইসব শব্দের কূলপ্লাবিনী রহস্য বা আরণ্যক মাদকতা
খেলা করে আমাকে নিয়ে
ঐ দূর পাহাড়-প্রতিবেশী অরণ্য দেখলে মনে হয়
ওখানে কখনো মানুষ প্রবেশ করেনি
যদিও জরিপের কাজ পৃথিবীতে আর কোথাও বাকি নেই—
অরণ্য চোখ ফিরিয়ে আমি অহঙ্কারী নারীদের
নদীর মতন উরু দেখেই তৎক্ষণাৎ
ঝাটিংগার মাংসল জলের স্রোত ও
খুনী আসামীদ্বয়ের ধ্যাতা মুখ এবং
সৈনিকের নিস্পৃহতা—
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ....

খেলা ভেঙে দিয়ে আমি বললাম, শান্তনু, দেশলাইটা দাও তো—
এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে
বন্দী করার চেষ্টা করি
তবু একটু পরেই ঝাটিংগা শব্দটি আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে
পাহাড়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়
এক প্রবল চিৎকার : হারাংগাজাও!

এ যেন লালডেঙ্গা বাজাচ্ছে তার সমর ভেঁপু
পাহাড়ী অরণ্যের ক্রুদ্ধ মানুষ ঘোষণা করছে নিজস্ব সীমানা
যেন আমাকেও সাড়া দিতে হবে, মনে মনে বলি,
দাঁড়াও, আমিও আসছি এক্ষুনি,
আমিও এই পৃথিবীর, তোমারই দলের
কত পাহাড় চূড়ায় এ জীবনে আর ওঠা হবে না
কত ক্ষমা চাওয়া বাকি থাকবে…
ঈষৎ নুয়ে পড়া এক রমণীর উপচে ওঠা বুকে
শেষবার চোখ রেখেছে
যমজের মতন ঐ দুই খুনী আসামী
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের আর কোনো দোষ নেই—
মেখলা কখনো আচমকা খুলে যায় কিনা এই নিয়ে গুপ্ত গবেষণা
সমতলে উৎকট গ্রীষ্ম, এখানে ঠাণ্ডা নরম হাওয়া
হঠাৎ পাতলা মেঘ এসে নদীটি আর দৃশ্য নয়,
মাদক ছলচ্ছল ধ্বনি—
রেলবাবুটির দরাদরি শেষ হয়নি, পাথর থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে জল
সকালের নিথর আচ্ছন্নতা খানখান করে ভেঙে
অন্তরীক্ষে বিশাল গর্জন জেগে ওঠে :
ঝা-টি-ং-গা ! হা-রা-ং-গা-জা-ও !
এই বুনো রোমাঞ্চকর শব্দ
ট্রেনের কামরা থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে
বার করে নিয়ে বলতে চায়—
এসো, এসো, দ্বিধা করছো কেন, তুমিও পৃথিবীর আদিবাসী !

আমার কৈশোরে

শিউলি ফুলের রাশি শিশিরের আঘাতও সয় না
অন্তত আমার কৈশোরে তারা এরকমই ছিল
এখন শিউলি ফুলের খবরও রাখি না অবশ্য
জানি না, তারা স্বভাব বদলেছে কিনা ।

আমার কৈশোরে শিউলির বোঁটার রং ছিল শুধু
শিউলির বোঁটারই মতন
কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলতো না
আমার কৈশোরে পথের ওপর ঝরে পড়ে থাকা
শিশিরমাখা শিউলির ওপর পা ফেললে
পাপ হতো
আমরা পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।

আমার কৈশোরে শিউলির সম্মানে সরে যেত বৃষ্টিময় মেঘ
তখন রোদ্দুর ছিল তাপহীন উজ্জ্বল
দু' হাত ভরা শিউলির ঘ্রাণ নিতে নিতে মনে হতো
আমার কোনো গোপন দুঃখ নেই, আমার হৃদয়ে
কোনো দাগ নেই
পৃথিবীর সব আকাশ থেকে আকাশে বেজে উঠছে উৎসবের বাজনা!
সাদা শিউলির রাশি বড় শুদ্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই
বলতে ইচ্ছে করতো,
আমি কারুকে কখনো দুঃখ দেবো না—
অন্তত এরকমই ছিল আমার কৈশোরে
এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।

রূপালি মানবী

রূপালি মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণ ধারায়
ভিজিও না মুখ, রূপালি চক্ষু, বরং বারান্দায় উঠে এসো
ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
রূপালি মানবী, তালা খুলে নাও, দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও,
অথবা অন্ধকারেই বসবে, কাচের শার্সি থাকুক বন্ধ
দূরে থেকে আজ বৃষ্টি দেখবে, ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, তালা খুলে নাও।

চাবি নেই, একি! ভালো করে দ্যাখো হাতব্যাগ, মন
অথবা পায়ের নিচে কার্পেট, কোণ উঁচু করে উঁকি মেরে নাও

চিঠির বাক্সে দ্যাখো একবার, রূপালি মানবী, এত দেরী কেন ?
বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, ঝড়ের ঝাপ্‌টা তোমাকে জড়ায়
তোমার রূপালি চুল খুলে দেয়, চাবি খুঁজে নাও—
তোমার রূপালি অসহায় মুখ আমাকে করেছে আরও উৎসুক—
ধাক্কা মারো না ! আপনি হয়তো দরজা খুলবে, পলকা ও তালা
অমন উতলা রূপালি মানবী তোমাকে এখন হওয়া মানায় না
অথবা একলা রয়েছো বলেই বৃষ্টি তোমাকে কোনো ছলে বলে
ছুঁতে পারবে না, ফিরবে না তুমি বাইরে বিপুল লেলিহান ঝড়ে—
তালা খুলে নাও ।

রূপালি মানবী, আজ তুমি ঐ জানলার পাশে বেতের চেয়ারে
একলা বসবে আঁধারে অথবা দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও
ঠাণ্ডা কাচের শার্সিতে রাখো ও রূপালি মুখ, দুই উৎসুক চোখ মেলে দাও ।

বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, আজ তুমি ঐ রূপালি শরীরে
বৃষ্টি দেখবে প্রান্তরময়, আকাশ মুচড়ে বৃষ্টির ধারা·····
আমি দূরে এক বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একলা রয়েছি,
ভিজেছে আমার সর্ব শরীর, লোহার শরীর, ভিজুক আজকে
বাজ বিদ্যুৎ একলা দাঁড়িয়ে কিছুই মানি না, সকাল বিকেল
খরচোখে আমি চেয়ে আছি ঐ জানলার দিকে, কাচের এপাশে
যতই বাতাস আঘাত করুক, তবুও তোমার রূপালি চক্ষু—
আজ আমি একা বৃষ্টিতে ভিজে, রূপালি মানবী, দেখবো তোমার
বৃষ্টি না-ভেজা একা বসে থাকা ।

জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না

আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না—
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম ।

আমার কেউ নাম রাখেনি, তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে,
আগুন দেখে আলো ভেবেছি, আলোয় আমার
হাত পুড়ে যায়
অন্ধকারে মানুষ দেখা সহজ ভেবে ঘূর্ণিমায়ায়
অন্ধকারে মিশে থেকেছি
কেউ আমাকে শিরোপা দেয়, কেউ দু' চোখে হাজার ছি ছি
তবুও আমার জন্ম-কবচ, ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি
আমার কোনো ভয় হয় না,
আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

শোকসভায় এক সন্ধ্যা

এইখানে বসবে এসো, অবিনাশ, বেদনার পাশের চেয়ারে
সাবধান, ছুঁয়ো না ওকে, ও বড় নশ্বর স্রোতে ভেসে যেতে চেয়ে
রূপালি আলোর চোখে থমকে আছে, উন্মোচিত চুলে
ক্ষণিক আঙুল রেখে ও যেন রক্তাক্ত সন্ধ্যা
দৃশ্যমান করে
ওর দৃষ্টি, আমি জানি, বড় ভয়ঙ্কর লক্ষ্যভেদী। সরে এসো,
অবিনাশ, স্পর্শ করো না, সাবধান!

সভাপতি বড় ক্রুদ্ধ, দেশ কাল বাণিজ্য সন্ততি
হুড়োহুড়ি করে মঞ্চে, সিগারেট খেতে উঠে গেল তিনজন
গত রাত্রে ঝড়ে ভাঙা গোলাপের ডাল থেকে ফুলগুলি ছিঁড়ে
কে শূন্যে রেখেছে গেঁথে? ফুলে বড় বিস্মরণ আসে
কে কোথায় জেগে আছে সকাল না গোধূলির শিয়রের
কাছে, ভুল হয়; চোখে ভাসে সহস্র নিয়তি।
(প্রতিটি বক্তার জন্য পুনরায় শোকসভা করে যেতে হবে একদিন)

চলো আমরা বাইরে যাই, অবিনাশ, আমাদের মত্ত কণ্ঠস্বরে
অজস্র গম্ভীর মুখে বিঘ্ন রেখা ফোটে।

বেদনা ওখানে থাক, একা স্তব্ধ, স্বপ্নদৃষ্ট, স্থির
ওর এত উগ্র রূপ, অমন উজ্জ্বল শাড়ি আজ আমাদের সঙ্গে
বড় বেমানান
তার চেয়ে শনিবার ওকে নিয়ে পেনেটিতে স-উপকরণ
বেলেল্লা নষ্টামি করে কিছুক্ষণ কাটবে চমৎকার।

চলো আমরা বাইরে যাই শঙ্কিত শোভায়, অন্ধকারে
হলুদ সর্ষের ক্ষেতে ভ্রমে বদ্ধ কৃষকের মতো
বহুদিন ভূমিকম্পে কাঁপেনি ধরিত্রী তাই মাথার উপরে
কেঁপে ওঠে চকিত আকাশ—
চতুর্দিকে গর্জমান লক্ষ লক্ষ জীবিত নিশ্বাস
কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে, একদা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল
আমাদের সঙ্গে যেতে ঠিক এই পথে হিরণ্ময়।
হিরণ্ময়, হিরণ্ময়, নাম ধরে ডেকে ওঠে
আমাদের বিপন্ন বিস্ময়।
দন্তশূলে কষ্ট পেলে লোকে বড় পরিহাস করে
তার চেয়ে মৃত্যু আরও লঘু মনে হয়।

কিশোর ও সন্ন্যাসিনী

ফকির সাহেবের প্রাচীন মাজারের কাছাকাছি আস্তানা গেড়েছিলেন সন্ন্যাসিনী
একটি কিশোর তার অল্প দূরে এসে দাঁড়াতো
আগরতলার ইজের ও চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি
পা দুটো ফাঁক করা, চুলে সর্ষের তেলের বাস
দ্যাখো, চিনতে পারো সেই কিশোরকে

না, তার মুখ দেখা যায় না। কিংবা অতিরিক্ত বিস্ময়ে তার
মুখচ্ছবি অস্পষ্ট।
একদিন সে গুটি গুটি এগিয়ে এসেছিল, কাছে, উবু হয়ে বসে
সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ভয় করে না?

সন্ন্যাসিনী তাঁর পুরু ওষ্ঠধর সামান্য ফাঁক করে হেসে বলেছিলেন....
মনে আছে কী উত্তর দিয়েছিলেন ?

না, সন্ন্যাসিনীর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দুলছিল একটু একটু
করতলে রাখা ছিল আমলকী
ধুনীর আগুনে তাঁর চোখ পাকা করমচার মতন রক্তিম
তাঁর জম্বুরার মতন দুটি বুক গেরুয়া ভেদ করে আসতে চায়
না, সন্ন্যাসিনী কী বলেছিলেন মনে নেই !

সন্ন্যাসিনী বাঁ হাতের তর্জনী তুলেছিলেন শুক্লা দ্বাদশীর
আকাশের দিকে—
কিশোর দেখলো, কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কালপুরুষ
একটা প্যাঁচা উড়ে গেল চাঁদ আড়াল ক'রে
মনে আছে ?

না, শুধু মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর কপালের ফোঁটায়
চটচটে মেটে সিঁদুর খেতে এসেছিল কয়েকটা পিঁপড়ে
ফকির সাহেবের মাজার থেকে ভেসে এসেছিল গুগ্‌গুলের গন্ধ
রাতচরা চোখ-গেল'র সঙ্গে ডেকে উঠেছিল শকুনের ছানা
তখন অনেক রাত
আধপোড়া কাঠে ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে সন্ন্যাসিনী হঠাৎ বলেছিলেন ক্লান্ত গলায়—
আমি আর বেশীদিন থাকবো না রে ! আমি বুকের মধ্যে
সব সময় চিলের ডাক শুনতে পাই ।
সেই কিশোর তখন সন্ন্যাসিনীর কপাল থেকে পিঁপড়ে খুঁটে
তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করেছিল,
ভয় করে ? তুমি কিছু পাওনি, তোমারও এখনো ভয় করে বুঝি ?

মুক্তি

একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল,
সে বলেছিল, আমি ফিরে আসবো
প্রতীক্ষায় থেকো।
জানি না সে কোথায় গেছে
কোন্ হিম নিঃসঙ্গ অরণ্যে
বা কোন্ নীলিমাভুক পাহাড় চূড়ায়
জানি না তার সামনে কত দুস্তর বাধা
জানি না সে সংগ্রাম করছে কোন্
অসহনীয়ের সঙ্গে।
সে মুক্তিফল আনবে বলেছিল
সে বলেছিল প্রতীক্ষায় থাকতে
আমি দ্বাদশ বৎসর থাকবো তার জন্য পথ চেয়ে
তার পরেও সে না ফিরলে
আমাকে যেতে হবে.....

আমিও না ফিরলে যাবে আমার সন্তান-সন্ততিরা।

যা ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হতে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুর্চি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ।

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ওঠানামা
ভুল ভাঙবার মতো অকস্মাৎ কূল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল ?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী....বুকে বড় কষ্ট হয়....
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না !

চন্দনকাঠের বোতাম

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি
যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছি বহুবার, কখনো প্রার্থনা জানাইনি
যেমন নারীর কাছে মৃত্যুকে সমর্পণ করেছিলাম
মৃত্যুর কাছে নারীকে
যেমন বৃক্ষের কাছে জল্লাদের মতন গিয়েছি কুঠার হাতে
উপকথার কাঠুরেকে করেছি উপহাস
যেমন মানুষের কাছে আমিও মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিলাম
কৃতজ্ঞতার বদলে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজের শৈশব দেখেও চিনতে পারিনি
লোকের মধ্যে শিশুকে আদর করেছি লৌকিকতাবশত
ডাকবাংলোর বন্ধ দরজার সামনে চাবির বদলে হাতুড়ি চেয়েছিলাম

যেমন ঝামরে-পড়া অন্ধকারের মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মেখে
এসেছিলাম আলোর কাছে
যেমন কুকুরের দাঁতে বার বার ছুঁয়েছি স্তন ও ওষ্ঠসমূহ
যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম
এক বোবা কালা প্রেত
যেমন বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে গলা মুচড়ে মেরেছিলাম ধবল হাঁস
কান্না লুকোবার জন্য নদীতে স্নান করতে গিয়েছি
যেমন অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল
আমার পূর্বজন্মের চেনা
অত্যন্ত মমতায় আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম রুপো বাঁধানো আয়না
যেমন ফিরে আসবো বলেও ফিরে যাইনি বেশ্যার কাছে
সমুদ্রের কাছেও আর যাইনি
ফিরে যাইনি ধলভূমগড়ের লালধুলোর রাস্তায়
দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতা ধাইমা'র কাছেও যাওয়া হয়নি
যেমন ঠিকানা হারিয়ে বহু চিঠির উত্তর লেখা হয় না
তবু জেগে থাকে অভিমান
যেমন মায়ের কাছেও গোপন করেছি শরীরের অনেক অসুখ
যেমন মনে মনে গ্রহণ করা অনেক শপথ কেউ শুনতে পায়নি
বলেই মেনে চলিনি
যেমন কাঁটা বেঁধার পর রক্ত দর্শনে সূর্যাস্তের আবহমান
দৃশ্য থেকে ফিরে আসে চোখ ;

তেমনই এই চৌতিরিশ বছরে এক ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে
আমার চকিতে দিগ্‌ভ্রম হয়
বৃক্ষসারি ছুটে যায় আমার আপাত গতির বিপরীত দিকে
পুকুরে স্নানের দৃশ্য মুহূর্তের সত্য থেকে পরমুহূর্তের অলৌকিক
আমার বুক টনটন করে ওঠে অথচ নির্দিষ্ট শোক নেই
সান্ত্বনার কথা মনে আসে না
আয়ুর সীমানা কেউ জানে না, তাই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি
কিন্তু মুহূর্তের সত্যেরই মতন, সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ে
কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতি প্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম
এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ
শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে
আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে ।

আমি যদি

পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানাতে চেয়েছে ডায়নামাইট
মানুষের জন্য রাস্তা
আজ তারা বিমান ও প্রসাদ ওড়াচ্ছে
মানুষেরই হাতে।
নদীর পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ দিয়ে
হেঁটে যায় মাথায় তালপাতার টোকা পরা
একজন মানুষ
সে এসব কিছু জানে না।

পশুর থেকে বলীয়ান হবার জন্য
একদিন তৈরী হয়েছিল অস্ত্র
আজ পশুরা সব নিহত
অস্ত্রগুলি ক্রমশ শাণিত হয়ে
লকলকে জিভ বার করে খুঁজছে শিকার
শস্ত্রপাণি মহাবীর যোদ্ধা ভিয়েৎনাম ও বাংলাদেশে
নিরস্ত্র শিশুকেও ছিন্নভিন্ন করতে
দ্বিধা করে না এখন।
যা একবার শুরু হয়, তা আর থামে না।
আমি নদীর পারে ঐ তালপাতার টোকা-পরা
মানুষটির সঙ্গী হতে
পারতাম যদি....

গদ্যছন্দে মনোবেদনা

ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা
মাঝে মাঝে মসৃণ পায়ের কাছে ঘষতে চায় মুখ, জানি তো অসীমে
ভাসিয়েছি আমার আত্মার সাদা পায়রা দূত, বলেছি মৃত্যুর চেয়েও সাচ্চা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা—তবু তার দু' একটা পালক খসে
জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হিমে।

মাঝে মাঝে গদি মোড়া চেয়ারে বসলেও ব্যথা করে পশ্চাৎদেশ, আমি জানি
আচম্বিতে পেয়ালা পিরিচ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল আমার
জানলার বাইরে থেকে নিয়তি চোখ মারে, শীর্ণ হাতে দেয় হাতছানি
আমি মনকে চোখ ঠেরে অন্যমনস্ক হই, ইস্ত্রি ঠিক রাখি জামার।

এসব ইয়ার্কি আর কদ্দিন হে ? শুধু বেঁচে থাকতেই হালুয়া
টাইট করে দিচ্ছে
অথচ কথা ছিল, সব মানুষের জন্য এই পৃথিবী সুসহ দেখে যাবো,
ঠিক যে রকম
প্রত্যেক মৌমাছির আছে নিজস্ব খুপরি, কিন্তু যার যখন ইচ্ছে
উড়ে যাবার স্বাধীনতা : ফুলের ভেতরে মধু সে জেনেছে, তবু
সঙ্ঘ সভ্যতার জন্য তার শ্রম।

হাসন্ রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ঢ্যাঁড়াক্যাড়া—মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা দ্যাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসন্ রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদলা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে দুলায়ে কোমর
যা বেটী হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি !

কও তো হাসন্ রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি ?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা !

জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাসান্ চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আশ্‌মান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পদ্মের নকশায় পইড়লো কিনা শেষ টান।

তিনজন মানুষ

গাড়ি বারান্দার নিচে আমরণ অনশনে বসে আছে
তিনজন শ্রমিক
আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!
শীর্ণ মুখে জ্বলজ্বলে চোখ, রুখু দাড়ি, জট-পাকানো চুল
আধো-হেলান দিয়ে বসা, ওদের ঘুম নেই, খালি পেট
তেতো জিভে ঘুম আসে না
ওদের দেখার জন্য ভিড় জমেনি, ওদের জন্য
মেডিক্যাল বুলেটিন বেরুবে না
আরও তিনচারজন শুধু চাটাইয়ের এক কোণে হাঁটু
আলোয়ানে মুড়ে বসা
নিঃশব্দ, সব কথা ফুরিয়ে গেছে—
বাড়ি ফেরার পথে আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!

মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসেছো কেন? কেড়ে খেতে পারলে না?
একথা স্বতই আমার মনে আসে, নিজেই লজ্জা পাই—
ওদের নেতারা কেউ এখানে নেই, তারা বাড়িতে ঘুমোচ্ছে
ওদের মালিকরা দিল্লি-বোম্বাইতে ঘুমন্ত
রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে খাটাখাটনি করছে দেড়শোজন ভৃত্য
দরজির কাছে কোমরের মাপ দিচ্ছে রোজ অসংখ্য মানুষ,

গোটা বড়বাজার জুড়ে চোঁয়া ঢেকুরের শব্দ
এখানে মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসে আছে তিনটি অভুক্ত মানুষ,
নিঃশব্দ
চোখে ঘুম নেই, ক্লান্ত, জিভে তেতো স্বাদ
থমথম করছে
হাওয়া, কেউ জানে না কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হতে চলেছে—
আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না ! আমি সইতে পারছি না ঐ
তিনজন মানুষের নিঃশব্দ বসে থাকা
তোলপাড় করছে আমার বুক, আমি বলতে চাই
সাবধান !
মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না ।
সাবধান ! মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না !
বাড়িতে ফিরে ভাতের থালার সামনে আমার গা
গুলিয়ে ওঠে—সারা রাত আমার ঘুম আসে না !

পেয়েছো কি ?

অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে
ভোরের কোকিল
কোকিল, তুমি কি পারো মুছে দিতে
সব কলরব ?
হেলেঞ্চা লতায় কাঁপে
শিশিরের বিদায়ী শরীর
শিশির, না আমার শৈশব ?
ভুলে যাওয়া ভালো, কিন্তু
কাঁটার মুকুট পরা মৃত্যু তো
সে নয় !

বৈশাখী আকাশ দেখে গাঢ় হয়
টিয়াঠুঁটি আম
সবই তো উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেলে
পেয়েছো কি
যা ছিল পাওয়ার ?
মধ্য জীবনের কাছে প্রশ্ন তোলে
স্থির মধ্যযাম ।

রক্তমাখা সিঁড়ি

চেয়েছি নতুন দিন,
স্নানসিক্ত পৃথিবীর নতুন মহিমা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা যেন মনুষ্য জন্মেই ঘটে যায়
বঞ্চনা শব্দটি যেন
অচেনা ভাষার মতো মূঢ় করে
এ জীবন আনন্দের, চতুর্দিকে হাহাকার মুছে যে রকম স্নিগ্ধ সুখ !
কখনো আনন্দ হয় ফুল ছিঁড়ে,
অপরের অন্ন কেড়ে নয়
চেয়েছি নতুন দিন শ্রেণীহীন, স্পর্ধাহীন, বিশুদ্ধ সমাজ
যখন মুখোশে আর
লুকোবে না মানুষের মুখ
শস্য ও বাণিজ্যে সব লোভের করাল দাঁত ভাঙা
কুটিল ও ষড়যন্ত্রী শৃঙ্খলিত,
পৃথিবীর সব জননীর
বুকের শিশুরা রবে নিরাপদ ;
একাকীত্বে কিংবা জনতায়
স্বপ্নের শব্দের মুক্তি—
ভালোবাসা মিশে যাবে দিগন্ত দেয়ালে
চেয়েছি নতুন দিন, গ্লানিহীন যৌবরাজ্য,
সৃষ্টিতে স্বাধীন !

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার
কণ্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ
প্রদীপ জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে মুখ দেখাদেখি
চাইনি শ্মশান-শান্তি,
চাইনি পিচ্ছিল গলি খুঁজি
সবাই পথিক তবু কে কোথায় যাবে তা ভুলে পথে মারামারি
চাইনি অস্ত্রের রোষ,
শত্রু ভুলে নেশাগ্রস্ত মারণ উল্লাস
বিবেকের ঘরে চুরি, স্বপ্নের নতুন দিন ধুলোয় বিলীন
চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয় ?
রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনো স্বর্গেও যাবো না !

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

কাল ভোরবেলা আমি শয়তানকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
আহ্বান করেছি
লাইব্রেরির মাঠে কাল অসি খেলা হবে ।
হৃদয়, উদ্বেলিত হয়ো না—
বাহু, সমুদ্যত থাকো, স্নায়ুরাশি, সতর্ক—
চোখ, তোমার চিনতে পারা চাই শয়তানের
চোখের গতি
কাল জীবন-মরণ অসি খেলা, কাল জিততে হবে ।

ভিড়ের মধ্যে শয়তান আমার কাঁধে হাত রাখতে চেয়েছিল
সে আমাকে অনুসরণ করেছে পাহাড় চূড়ায়
সালংকারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে অট্টহাসি হেসেছে—
আমি তার মুখে কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছি ।

শয়তানের একটা দাঁতের রং কালো
চোখের মণি দুটো হলুদ বর্ণ
তার দশ আঙুলে ছটা লোভের আংটি
সে আমাকে কেল্লার প্রান্তরের কথা বলেছিল
আমি তাকে আহ্বান করেছি লাইব্রেরির মাঠে
সেখানে আমি একা থাকবো না
শত শত সৎ মনীষার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে
অসি খেলা হবে কাল সকালে
যদি প্রতিপক্ষ জেতে, সমস্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ছাই হয়ে যাবে !

দু' পাশে

টেবিলের দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে থাকা, অন্তরীক্ষ চোখে
চোখাচোখি করে আছে
পলক পড়ার শব্দ, শুধু ক্ষণিকের অন্ধকার
চোখের ভাষার কাছে মানুষের কৃতঘ্ন সভ্যতা থেমে থাকে ।
আমি তো বুঝি না ঐ ভাষা, বুঝি না নিজেরই চোখ কোন্ কথা
বলে, তবু চেয়ে আছি
পরস্পর দুর্বোধ্যতা, ঢেকে রাখা বুক থেকে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস—
এর চেয়ে কত সোজা আঙুল স্পর্শের যোগাযোগ,
কাঁধের ওপরে রাখা
অমার্জিত হাত
শরীর সরব হলে দরজা-জানলা সেই ভাষা বোঝে
মুহূর্তের মর্ম বোঝে আয়ু
তবু আমি ভাষা-ভ্রান্ত, বিমূর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ।

ধাত্রী

শিয়ালদার ফুটপাথে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিপেজি বাহাত্তুরে রিফিউজি বুড়ি।
আঁতুড় ঘরে আমার মুমূর্ষু মায়ের কোল থেকে উনি
একদিন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন
এঁর ডাটো শরীরের স্তন্য পান করেছিলুম
প্রতিদিন শুষে নিয়েছি রক্ত
ধাইমা'র কুঁড়োর গন্ধ মাখা বুকে শুয়ে আমি
চিল-কান্না কেঁদেছি
রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে বসে আমাকে তেল মাখাতে মাখাতে
কত আদিখ্যেতা করতেন
মা-মাসিদের কাছে পরে অনেকবার শুনেছি সেই গল্প—
আমার ভেদ-বমির সময় অমাবস্যার মধ্যরাত্রে স্নান করে
তুলে এনেছিলেন গন্ধবাদালির পাতা
সত্যপীরের দরগায় মানত করেছিলেন আমলকী।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আমি সিকির বদলে
দশ নয়া খুঁজছিলাম
দিনকানা বুড়ি চাইছিল, দুটো পয়সা দে বাবা!
ধাইমা, তুমি প্রথম আমার চোখ ফাঁক করে দিয়েছিলে
গোলাপজল,
দেখিয়েছিলে পৃথিবী
ধাইমা, এ কোন্ পৃথিবী আমাকে দেখালে?
বুড়ি, সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিলি
এই অকল্পনীয় পৃথিবীতে
আমি আর কত কিছু হারাবো?

মানে আছে

প্রবল স্রোতের পাশে হেলে পড়া কদম বৃক্ষটি ?
এরও কোনো মানে আছে
নির্জন মাঠের মধ্যে পোড়োবাড়ি—হা হা করে ভাঙা পাল্লা
এরও কোনো মানে আছে।
ঠিক স্বপ্ন নয়, মাঝে মাঝে চৈতন্যের প্রদোষে-সন্ধ্যায়
শিরশিরে অনুভূতি
কি যেন ছিল বা আছে, অথবা যা দেখা যায় না
দুরন্ত পশুর মতো ছুটে আসে বিমূঢ়তা
জানলার পর্দাটা দুলছে কখনো আস্তে বা জোরে
এরও কোনো মানে নেই ?

চুম্বন সংলগ্ন কোনো রমণীর চোখে আমি দেখিনি কি
অন্যমনস্কতা ?
চেনা বানানের ভুল বার বার। অকস্মাৎ স্মৃতির অতল থেকে
উঠে আসে
শৈশবের প্রিয় গান, দু' একটা লাইন
বারান্দায় পাখিটি বসেই ফের উড়ে যায়
হেমকান্তি সায়াহ্নের দিকে
এরও কোনো মানে নেই ?

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

কতটুকু দূরত্ব ? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই

আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে....

বাইরে বড় চ্যাঁচামেচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ সবকিছুই তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মতো বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গির
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না
বুকে বুকে রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে !

কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে

দু'জন খসখসে সবুজ উর্দি পরা সিপাহী
কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে—
কবি প্রশ্ন করলেন : আমার হাতে শিকল বেঁধেছো কেন ?
সিপাহী দু'জন উত্তর দিল না ;
সিপাহী দু'জনেরই জিভ কাটা ।
অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় তাদের পায়ে ভারী বুটের শব্দ
তাদের মুখে কঠোর বিষণ্ণতা
তাদের চোখে বিজ্ঞাপনের আলোর লাল আভা ।

মেটে রঙের রাস্তা চলে গেছে পুকুরের পার দিয়ে
ফ্লোরেসেন্ট বাঁশঝাড় ঘুরে—
ফসল কাটা মাঠে এখন
সদ্যকৃত বধ্যভূমি ।
সেখানে আরও চারজন সিপাহী রাইফেল হাতে
তাদের ঘিরে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ
কেউ এসেছে বহু দূরের অড়হর ক্ষেত থেকে পায়ে হেঁটে
কেউ এসেছে পাটকলের ছুটির বাঁশী আগে বাজিয়ে
কেউ এসেছে ঘড়ির দোকানে ঝাঁপ ফেলে
কেউ এসেছে ক্যামেরায় নতুন ফিল্‌ম ভরে
কেউ এসেছে অন্ধের লাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জননী শিশুকে বাড়িতে রেখে আসেননি
যুবক এনেছে তার যুবতীকে
বৃদ্ধ ধরে আছে বৃদ্ধতরের কাঁধ
সবাই এসেছে একজন কবির
হত্যাদৃশ্য
প্রত্যক্ষ করতে ।

খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো কবিকে,
তিনি দেখতে লাগলেন
তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো—
কনিষ্ঠায় একটি তিল, অনামিকা অলঙ্কারহীন
মধ্যমায় ঈষৎ টনটনে ব্যথা, তর্জনী সংকেতময়

বৃদ্ধাঙ্গুলি বীভৎস, বিকৃত—
কবি সামান্য হাসলেন,
একজন পিসাহীকে বললেন, আঙুলে
রক্ত জমে যাচ্ছে হে,
হাতের শিকল খুলে দাও !
সহস্র জনতার চিৎকারে সিপাহীর কান
সেই মুহূর্তে বধির হয়ে গেল ।

জনতার মধ্য থেকে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন একজন কসাইকে,
পৃথিবীর মানুষ যত বাড়ছে, ততই মুর্গী কমে যাচ্ছে ।
একজন আদার ব্যাপারী জাহাজ মার্কা বিড়ি ধরিয়ে বললেন,
কাঁচা লঙ্কাতেও আজকাল তেমন ঝাল নেই !
একজন সংশয়বাদী উচ্চারণ করলেন আপন মনে,
বাপের জন্মেও একসঙ্গে এত বেজন্মা দেখিনি, শালা !
পরাজিত এম এল এ বললেন একজন ব্যায়ামবীরকে,
কুঁচকিতে বড় আমবাত হচ্ছে হে আজকাল !
একজন ভিখিরি খুচরো পয়সা ভাঙিয়ে দেয়
বাদামওয়ালাকে
একজন পকেটমারের হাত অকস্মাৎ অবশ হয়ে যায়
একজন ঘাটোয়াল বন্যার চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ে
একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর ছাত্রীদের জানালেন :
প্লেটো বলেছিলেন···
একজন ছাত্র একটি লম্বা লোককে বললো,
মাথাটা পকেটে পুরুন দাদা ।
এক নারী অপর নারীকে বললো,
এখানে একটা গ্যালারি বানিয়ে দিলে পারতো····
একজন চাষী একজন জনমজুরকে পরামর্শ দেয়,
বৌটার মুখে ফোলিডল ঢেলে দিতে পারো না ?
একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বলে,
রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী উর্বর হবে না ।
তবু কারা যেন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, এ তো ভুল লোককে
এনেছে । ভুল মানুষ, ভুল মানুষ !

রক্ত গোধূলির পশ্চিমে জ্যোৎস্না, দক্ষিণে মেঘ,
বাঁশবনে ডেকে উঠলো বিপন্ন শেয়াল
নারীর অভিমানের মতন পাতলা ছায়া ভাসে
পুকুরের জলে
ঝুমঝুমির মতন একটা বকুল গাছে কয়েকশো পাখির ডাক
কবি তাঁর হাতের আঙুল থেকে চোখ তুলে তাকালেন
জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে
রেখা ও অক্ষর থেকে রক্তমাংসের সমাহার
তাঁকে নিয়ে গেল অরণ্যের দিকে
ছেলেবেলার বাতাবি লেবু গাছের সঙ্গে মিশে গেল
হেমন্ত দিনের শেষ আলো
তিনি দেখলেন, সেতুর নিচে ঘনায়মান অন্ধকারে
একগুচ্ছ জোনাকি
দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হলো চুল, তিনি বুঝতে পারলেন
সমুদ্র থেকে আসছে বৃষ্টিময় মেঘ
তিনি বৃষ্টির জন্য চোখ তুলে আবার
দেখতে পেলেন অরণ্য
অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষের স্বাধীনতা—
গাব গাছ বেয়ে মন্থর ভাবে নেমে এলো একটি তক্ষক
ঠিক ঘড়ির মতন সে সাতবার ডাকলো :

সঙ্গে সঙ্গে রিপুর মতন ছ'জন
বোবা কালা সিপাহী
উঁচিয়ে ধরলো রাইফেল—
যেন মাঝখানে রয়েছে একজন ছেলে-ধরা
এমন ভাবে জনতা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :
ইনকিলাব জিন্দাবাদ !
কবির স্বতঃপ্রবৃত্ত ঠোঁট নড়ে উঠলো
তিনি অস্ফুট হৃষ্টতায় বললেন :
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !
মানুষের মুক্তি আসুক !
আমার শিকল খুলে দাও !
কবি অত মানুষের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ
নারীদের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি নারী

তিনি দু'জনকেই পেয়ে গেলেন
কবি আবার তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললেন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! মিলিত মানুষ ও
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব !

প্রথম গুলিটি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—
যেমন যায়,
কবি নিঃশব্দে হাসলেন,
দ্বিতীয় গুলিতেই তাঁর বুক ফুটো হয়ে গেল
কবি তবু অপরাজিতের মতন হাসলেন হা-হা শব্দে
তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ
কবি শান্ত ভাবে বললেন,
আমি মরবো না !
মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না ।
চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তাঁর কপাল
পঞ্চম গুলিতে মড় মড় করে উঠলো কাঠের খুঁটি
ষষ্ঠ গুলিতে কবির বুকের ওপর রাখা ডান হাত
ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল
কবি হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন মাটিতে
জনতা ছুটে এলো কবির রক্ত গায়ে মাথায় মাখতে—
কবি কোনো উল্লাস ধ্বনি বা হাহাকার কিছুই শুনতে পেলেন না
কবির রক্ত ঘিলু মজ্জা মাটিতে ছিটকে পড়া মাত্রই
আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলো দারুণ তোড়ে
শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কবির ঠোঁট একবার
নড়ে উঠলো কি উঠলো না
কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি ।

আসলে, কবির শেষ মুহূর্তটি মোটামুটি আনন্দেই কাটলো
মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে চাইলেন,
বলেছিলুম কিনা, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না !

দেরি

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি
দাঁড়াও, আমি আসছি
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়।
রন্ধ্রের মধ্যে শোনা যায় কীটের আনাগোনার শব্দ
অসংখ্য দর্জিরা তৈরি করছে ছদ্মবেশ
নদীর নিরালা কিনারে জানু পেতে বসে আছেন
শৈশবে দেখা অন্ধ ফকির
স্মৃতির অস্পষ্টতায় সমস্ত স্তব অসমাপ্ত
বালিকার বুকের কাছে অনেক ভুল প্রত্যাহার করা হয়নি
কুমিররা এখনো কুম্ভীরাশ্রু ছড়িয়ে যাচ্ছে
নিশান উড়িয়ে চলে যায় মধ্য রাত্রির ট্রেন
অনেকক্ষণ বাজতে থাকে তীব্র হুইস্‌ল।

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি,
দাঁড়াও, আমি আসছি
প্রথানুগত চৈতন্য থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে এসে আর তাকে
দেখতে পাই না।
অসংখ্য প্রতিশ্রুতির ওপর শ্যাওলা জমে
শুনতে পাই অনেক অশরীরীর অট্টহাস্য—
যাদের জন্য একদা সোনার রথ নেমে এসেছিল।
বিষণ্ণতাকে লণ্ডভণ্ড করে ছিঁড়ে উঠে আসতেও হাতে জড়িয়ে
যায় সুতো
সুপুরিবাগানের মিহি হাওয়াকে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস
কোদালকে কোদাল, ইস্কাপনকে ইস্কাপন এবং
অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনে নিতে
অনেক কুয়াশা
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়
আমার দেরি হয়ে যায়, আমার দেরি হয়ে যায়,
আমার দেরি হয়ে যায়!

সেই মুহূর্তটা

দরজা বন্ধ, কলিং বেলে হাত, শ্রবণ উৎকর্ণ
হৃদয় সেখানে নেই।
বৃষ্টি রমণীয়, নীল সঙ্ঘ ভাঙা বৃষ্টি, শরীর ভিজিয়ে এসে
শুষ্ক মুখ—
আঙুলে আঙুল ছোঁয়া, আরও কাছে, বুকে মিশলো বুক,
চাপ, আরও চাপ,
প্রথমে ঘাড়ের পাশে, পরে ঠোঁটে ঠোঁট—ঠিক সেই মুহূর্তে
একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়।
নিছক চিৎকার, তার ভাষা নেই, এইমাত্র যেরকম হৃদয়হীন সিঁড়িভাঙা
(ওঠা সাবধানী, নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়িয়ে পড়ার ঠিক আগে সেই যে মুহূর্তটা)
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পালকের মতন এক একটা স্বপ্ন
কখনও যেন হঠাৎ হাঁটু দুমড়ে আসে, নদী আড়াল করে দাঁড়ায় বন্ধু
কাঁচ ভাঙা হাসি প্রত্যেকবার মনে হয় অচেনা
মৎস্য চিহ্নিত দেয়ালে, সঙ্কেত অগ্রাহ্য করি, কিশোরীর
সুরেলা কণ্ঠে 'বেলা যায়'
আর চমকে দেয় না
বিশাল আলমারির চাবি হারালে, মনে হয় এই বুঝি সেই,
কব্জির দিকে চোখ, পেশী শক্তিশালী
মনে হয়, এবার—
কিছুই হয় না
ইস্পাতও বশ্যতা স্বীকার করে, পথ পাদপ্রদীপ হতে চায়
খরার নামে যেরকম ছুটে আসে বিশ্বব্যাপী দয়া
চাপা পড়ে যায় সেই আসল সময়—
চোখ কৃতঘ্ন, অচেনারা মোহিনী, কানু সান্যাল সব্যসাচী,
শুধু সাবধানে সিঁড়িভাঙা
নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়ানো নয়, সেই মুহূর্তটা
থমকে আছে কোথাও, ছুঁতে পারছি না।

দেখা হয়নি

নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি
পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে
অনেক যুদ্ধ, অনেক আগুন নিভিয়ে
আলো জ্বালানো
অনেক পথ পেরিয়ে নদীকে খুঁজে পাওয়া
কিন্তু তার আগে এই প্রচণ্ড বাধা
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি ।

এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না
এত আলিঙ্গনেও অধরা
এই রহস্যময় প্রাণীটি
বার বার আমার চোখ ফিরিয়ে নেয়
পাহাড় ও সমুদ্রের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে
তার মাঝখানে একজন রমণী, বরবর্ণিনী, স্বয়মাগতা।
আমি সূর্যাস্ত ও মধ্যযামকে বদলে দিই
মুখোমুখি দর্পণের মতন সংখ্যাহীন প্রকোষ্ঠ
তার শুরু ও শেষে লুকিয়ে আছ, কে তুমি ?
তোমাকে এখনও একটুও দেখা হয়নি !

সেই ছেলেটি ও আমি

সেই ছেলেটির চোখে দীপ্ত রোখ
ঠোঁটে ক্রুদ্ধ তেজের ঝলক
ও হাতে রাইফেল তুলে নেবার স্বপ্ন দেখছে
আমি ওর মধ্যে দেখছি আমার কৈশোরের স্বপ্ন ।

ছেলেটি তার হালকা ছিপছিপে শরীরটা নিয়ে
রক থেকে লাফিয়ে এলো রাস্তায়
আগুন ও টিয়ার গ্যাসের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে
ছুটে গেল অবহেলায়
ও যেন ঠিক আমার কৈশোর কাল হয়ে ছুটে গেল !

ছেলেটার জামা ছিন্নভিন্ন, কপালের পাশে রক্ত
ছেলেটা তবু হার মানেনি
ধ্বংসের আগুনের মধ্যে ও এখনো স্বপ্ন দেখছে
তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, জিন্দাবাদ !
রাস্তার ওপাশ থেকে আমি শুনতে পেলাম
যেন অবিকল আমারই গলার আওয়াজ ।

মানুষ

পার্কের রেলিং-এর পাশে ইঁটপাতা
অস্থায়ী উনুনে
গাঢ় হলুদ রঙের খিচুড়ি ফুটছে—
বাচ্চাটা খেলছে রাস্তায় ধুলোয়
মা আঁস্তাকুড় থেকে বেছে নিচ্ছে তরকারির খোসা
পুরুষটা শুয়ে শুয়ে দেখছে দুপুর-রোদের আকাশ
তার ঠোঁটে বার বার এসে বসছে মাছি
ভিখারী পরিবার—অন্যদিন ওদের দিকে চোখ পড়ে না
আজ ইঁটের উনুন ও খিচুড়ি দেখে পিকনিকের কথা
মনে পড়লো
ওরা কি সারাজীবনের জন্য পিকনিক করতে এসেছে ?

মেয়েটি উঠে গেল বেহালার ট্রামে
ছেলেটি তারপর একা একা হাঁটতে লাগলো
দোহারা, শ্যামলা রং, কুড়ি-একুশ, মুখখানি ভারি বিষণ্ণ
ও অহঙ্কারী—
ও কেন বিষণ্ণ ? ও কেন এই পরিব্যাপ্ত মেঘলা দুপুরে
দেখছে না এই ভুবনমোহিনী অচেনা আলো ?
তবু ছেলেটির ওষ্ঠভঙ্গির অহঙ্কার দেখেই মনে হলো
ও একজন ছদ্মবেশী রাজকুমার
সদ্য মহিমাচ্যুত, কিন্তু এই ছদ্মবেশ
তার নিজস্ব

মেয়েটিও কি রাজেন্দ্রাণী ? ট্রামে উঠে গেল, ভালো করে
মুখ দেখিনি
মেঘলা দুপুরে ময়দানে একা একা হাঁটছে
আমার ছদ্মবেশী রাজকুমার ।

বিকেল পাঁচটায় হাওড়া ব্রীজে কত সংখ্যক মানুষ
সবাই কেজো, ব্যস্ত, এ ওকে ঠেলছে, এ ওর
পা মাড়িয়ে দিচ্ছে
যেতে হবে, যেতে হবে, ঠিক সময়ে যেতে হবে !
কোথায় যাবে ওরা ?
যে-যার লোকাল ট্রেনের সময় মেপে রেখেছে
চার্লি চ্যাপলিনের ছবির মতন হাস্যকর হুড়োহুড়ি
হঠাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ছুটে আসে
পাগলা-হাওয়া
ফুলের বাজারে হুলুস্থুলু
জাহাজের মন-খারাপ ভোঁ জ্বেলে দেয় নগরীর আলো
হাওড়া ব্রীজের মানুষগুলো আমার কাছে
স্পষ্ট হয়ে ওঠে—
ওরা সবাই আসলে ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে
কোথায় কোন্ কৌটোয় লুকোনো আছে
লোকশ্রুত ভ্রমর !

পতন

স্মৃতি এসে বলে : পূর্ব দিকে যাও, তোমার নিয়তি
প্রতীক্ষায় আছে—
আমি তাকে চোখ তুলে দেখাই ও প্রাসাদের বিশাল পতন—
ভাঙে হৃদয় গম্বুজ, ইঁটকাঠ, ভয়ঙ্কর শব্দে পড়ে
কড়ি বরগা
পিতার টেম্পারা ছবি, জংধরা সিন্দুক
ওড়ে সিন্দুর মাখানো রাজমুদ্রা, শূন্য খাঁচা, অবিরল
মেঘের গর্জন

মায়ের দুঃখিত মুখ, নবীনা নারীর চোখ ভেসে যায়,
ভেসে যায় স্তনযুগে প্রথম উষ্ণতা,
ওকি অসম্ভব শব্দ, প্রবল হাওয়ায় ভাসে ছিন্ন হাত, বই
লুকানো বাজির মতো মধ্যরাতে জেগে ওঠে রক্তমাখা বাল্যের প্রেমিকা
ফেটে পড়ে সহস্র দৃশ্যের ভাণ্ড, আমি পাশ ফিরে
দেখি, ততক্ষণে
গুপ্তচর স্মৃতি পেয়ে গেছে অ্যাকিলিসের গোড়ালি ।

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের পিঠের মতন
পাহাড়
জয়ডঙ্কা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এসবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয় ।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরন হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে ;
সেই সব মুহূর্তে, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মুষ্টিতে গুঁজে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে !

তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধেবেলার আকাশে খেলা করে সাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মুছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দুঃখ
মানুষের দুঃখই শুধু তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়।

রাগী লোক

রাগী লোকেরা কবিতা লিখতে পারে না
তারা বড্ড চ্যাঁচায়
গহন সংসারের ম্লান ছায়ায় রাগী লোকরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ
তারা নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসে।
পাহাড়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া জলপ্রপাতের পাশে
আমি একজন রাগী লোককে দেখেছিলাম
তার বাঁকা ভুরু ও উদ্ধত ভঙ্গিমার মধ্যেও কি অসহায়
একজন মানুষ—
নদীর গতিপথ কেন খালের মতন সরল নয়
এই নিয়ে লোকটি খুব রাগারাগি করছিল!
হাতে এক গোছা চাবি
তবু তালা খোলার বদলে সে পৃথিবীর সব
দরজা ভেঙে ফেলতে চায়—
ঐ লোকটি কোনোদিন কবিতা লিখতে পারবে না
এই ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছিল খুব!
পাহাড় ও জলপ্রপাতের পাশে সেই
বিশাল সুমহান প্রকৃতির মধ্যে
বাজে পোড়া শুকনো গাছের মতন দাঁড়িয়ে রইলো
একজন রাগী মানুষ।

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয় !

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক !

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি !
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি ।

এ পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে ?
বেড়াতে আসা, তাই তো মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া !
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া ?

সৃষ্টিছাড়া

কলমের এক আঁচড়ে দুঃখী ঐ লোকটিকে সুখী করে
দিতে পারি আমি ?
সে তার দুঃখের মধ্যে সমুদ্যত, মাতৃহন্তারক সম ক্রূর হাস্যে
নিঙড়ে নেয় চোখ
আমি তার কপাল রেখেছি অমলিন—সে তবুও ভুরুর গভীরে কাটা দাগ
দেখায় আঙুল তুলে, অসহিষ্ণু পায়ে
আমার কল্পিত পথ ছেড়ে যায়—
আমি তাকে বারংবার শান্ত হতে বলি
নিবিড় বন্ধুর মতো আমি তাকে মাটির গভীর শান্তি, রমণীর মেঘলা হাত
কিংবা বিংশ শতাব্দীর নীল বিচ্ছুরিত আলোর সমীপে
নিয়ে যেতে চাই
সে তবু অস্থির গর্জন করে, লণ্ডভণ্ড করে দেয় পর্দা
নারীর চিবুকে রাখে দাঁত, স্তনে নোখ, উরুতে ছড়ায়
তপ্ত শ্বাস
তার অতৃপ্তির মধ্যে খেলা করে ধ্বংস সুখ, আয়নার বদলে
অগ্নিকাণ্ডে দেখে মুখ
আমার বুকের মধ্যে সুষুপ্ত বাসনাগুলি ছিঁড়ে খুঁড়ে বদলে দিতে চায়
কলম সরিয়ে রেখে আমি তার মুখোমুখি বসি
কঠিন ভর্ৎসনা করে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই
সে তখনও ইয়ার্কির মুখভঙ্গি করে, পাঁজরা-কাঁপানো হাসি
দিয়ে, তুড়ি মেরে
আমাকে অগ্রাহ্য করে কালপুরুষের দিকে দেখায় তর্জনী !

ছায়া

হিরণ্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ো না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো ।

হিরণ্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ,
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো ?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ো না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ায় মুখ চুম্বন করো ।

ভুল বোঝাবুঝি

এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয়
এই যে অস্থির বিষণ্ণতা আমার
এর কোনো শেষ নেই
বুকের মধ্যে প্রায়ই হাজার হাজার সুঁচ ফোটে
মনে হয় পথ ভুলে চলে এসেছি পিঁপড়েদের দেশে
চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি সেই মানুষ নই
আমার হাতে দাগ নেই !
দু'একটি মুহূর্ত বাতাসে তুলো বীজের মতন
দুলতে দুলতে চলে যায় শৈশবের দিকে
বহুকাল চেয়ে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস
বেরুবার পথ পায় না
কত ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল আমার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়
তুমিই এসব কিছুর জন্য দায়ী,
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?

এ তো অভিমান নয়, এর নাম পিপাসা
আমি আনন্দের গান গেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম
যদিও আমার গলা ভাঙা

একটি শিশু টলমলে পায়ে হাততালি দিয়ে উঠলো
আমি তাকে স্থির মুহূর্ত দিতে চেয়েছিলাম
উজ্জ্বল ফুলকি ওঠা ঝর্ণায় চেয়েছিলাম অবগাহন
পৃথিবীকে আমি প্রায়শ চেয়েছি সীমানাহীন
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?
কেন ঐ নবনীত হাতের পাঞ্জা সরিয়ে নিলে—
আমি নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম !

প্রেমবিহীন

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া,
ধৃষ্ট বাঞ্ছা মুছে গেলে পার্থিব ললাটে, ওষ্ঠে চুলে
খেয়ালি আগুন থেকে কে বাঁচাবে ? বৃক্ষসম দয়া
সবুজ আঁচলে ঢেকে, জয়া, তুমি এসেছিলে মায়াবী আঙুলে—
বিশ্ব চরাচর ছুঁয়ে দিতে, যেন বিশ্বাসের গোপন সৌন্দর্যে,
প্রতিভায়
বিখ্যাত শান্তিকে পাবে, যেন আমি পৃথিবীর
সবটুকু খনিজ গন্ধক
চুরি করে হেসে উঠবো হা-হা শব্দে, অস্ত্রহীন রাত্রির বিভায়
আমাকে সাজাতে বুঝি চেয়েছিলে, দয়াময়ী,
সভ্যতার শেষ বিদূষক ?

পৃথিবীকে ভালোবাসবো, এতখানি ভালোবাসা এই বুকে নেই
গভীরে প্রতিষ্ঠাবান আয়ুহীন কীর্তির পাতাল ;
মুহূর্তে জীবন শিল্প চূর্ণ হয়, গ্লানিহীন, পরমুহূর্তেই
ঝলসে ওঠে স্মৃতিমূর্তি, গ্লানিহীন খেয়ালি আগুনে চিরকাল ।
ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব খরচক্ষে, অটুট শরীরে
অভিলাষ গুপ্ত করে কৃষ্ণকায় হীরকের মতো,
এক জীবনের শোক অনেক ভাটার স্রোতে আসে ফিরে ফিরে
জয়া, তোর প্রেম পেলে উরুদ্বয় শক্তিমান হতো !

উনিশশো একাত্তর

মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ
মা, আমারও পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই
নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি
ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।

এখন জয়ের দিন, এখন বন্যার মতো জয়ের উল্লাস
জননীর চোখ শুকনো, হারানো কন্যার জন্য বৃষ্টি নামে
হাতখানি সামনে রাখা, যেন হাত দর্পণ হয়েছে
আমারও সময় নেই, মাঠে কনিষ্ঠের লাশ খুঁজে ফিরি।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
একা একা হাহাকার ; আজিজুর, আজিজুর, শোন—
আমার হলুদ শার্ট তোকে দেবো কথা দেওয়া ছিল
বেহেস্তে যাবার আগে নিলি না আমার দেহ ঘ্রাণ ?

লিকলিকে লম্বা ছেলে যেন একটা চাবুক, চোয়ালে
কৈশোরের কাটা দাগ, মা'র চোখে আজও পোলাপান
চিরকাল জেদী ! বাজি ফেলে নদীর গহ্বর থেকে মাটি তুলে আনতো
মশাল জ্বালিয়ে আমি ভাগাড়ের হাড়মুণ্ডে চিনবো কি তাকে ?

মা, তোমার লাবণ্যকে শেষ দেখি জুলাইয়ের তেসরা
শয়তানের তাড়া খেয়ে ঝাঁপ দিল ভরাবর্ষা নদীর পানিতে
জাল ফেলে তবু ওকে টেনে তুললো, ছটফটাচ্ছে যেন
এক জলকন্যা
স্টিমারঘাটায় আমি তখন খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া বাঁধা।

ক'টা জন্তু নিয়ে গেল টেনে হিঁচড়ে, হঠাৎ লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে
তাকালো সবার চোখে, দৃষ্টি নয়, দারুণ অশনি
ঐটুকু মেয়ে, তবু এক মুহূর্তেই তার রূপান্তর ত্রিকাল-মায়ায়
কুমারীর পবিত্রতা নদীকেও অভিশাপ দিয়ে গেল।

মা, তোমার লাবণ্যকে খুঁজেছি প্রান্তরময়, বাঙ্কারে ফক্সহোলে

ছেঁড়া ব্রা রক্তাক্ত শাড়ি—লুণ্ঠিত সীতার মতো চিহ্ন পড়ে আছে
দূরে কাছে কয়েক লক্ষ আজিজুর অন্ধকার ফুঁড়ে আছে
ধপধপে হাড়ে
কোথাও একটি হাত মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়
কবরে লুকিয়ে ঢোকে ফুল চোর, মধ্য রাত্রে ভেঙে যায় ঘুম
শিশুরা খেলার মধ্যে হাততালি দিয়ে ওঠে, পাখিরাও
এবার ফিরেছে।